একক ৩৯ ❒ অর্থালংকার

গঠন

৩৯.১ উদ্দেশ্য
৩৯.২ প্রস্তাবনা
৩৯.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়
৩৯.৪ সারাংশ-১
৩৯.৫ অনুশীলনী-১
৩৯.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
৩৯.৬.১ উপমা
৩৯.৬.২ রূপক
৩৯.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা
৩৯.৬.৪ সমাসোক্তি
৩৯.৬.৫ অতিশয়োক্তি
৩৯.৬.৬ ব্যতিরেক
৩৯.৭ সারাংশ-১
৩৯.৮ অনুশীলনী-২
৩৯.৯ মূলপাঠ-৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি
৩৯.৯.১ বিরোধমূলক : বিরোধাভাস (বিরোধ)
৩৯.৯.২ শৃঙ্খলামূলক : একাবলি
৩৯.৯.৩ ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস
৩৯.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক : ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি
৩৯.১০ সারাংশ-৩
৩৯.১১ অনুশীলনী-৩

৩৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে—

- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকের অর্থে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।
- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকে বা বাক্যে বা শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার দক্ষতা কবি কতটা দেখাতে পারলেন, তা বিচার করা সম্ভব হবে।
- বাংলা কবিতার স্তবকে বাক্যে শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার নানারকম কৌশল কবিরা কীভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, তা অনুসরণ করা ক্রমশ সহজ হবে।

৩৯.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে অলংকারের যে দুটি মূলবিভাগের কথা জেনেছিলেন, তার প্রথমটির (শব্দালংকার) পরিচয় পেলেন একক ৬-এ। একক ৭-এ পাবেন দ্বিতীয় বিভাগটির পরিচয়। এ বিভাগটির নাম অর্থালংকার।

এসব অলংকার তৈরি হয় কবিতার মনস্ক পাঠকের বোধে—তাঁর মনে-মস্তিষ্কে। বিভাগটি আয়তনে শব্দালংকারের তুলনায় অকেনটাই বড়ো, অনেক তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে, মূলপাঠকে তিনটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হল।

প্রথম অংশে অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আর তার অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণির পরিচয়, তৃতীয় অংশে অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণির পরিচয় সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া হল। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাসঙ্গিক অলংকারের ব্যাখ্যা করা হল।

৩৯.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গো সঙ্গো অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। একটি উদাহরণ থেকে অর্থালংকারের এই স্বভাবটা বুঝে নেওয়া যাক :

'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
গগনের নীলগাঙে।'

'মেঘের মউজ'-এর অর্থ 'মেঘের ঢেউ', 'গগনের নীলগাঙ'-এর অর্থ 'আকাশের নীলরঙা নদী।' এই অর্থের ওপর নির্ভর করেই দুটি শব্দগুচ্ছ মিলেমিশে একটি দৃশ্য রচনা করেছে নীল আকাশের বুকে। সে-দৃশ্য মেঘের খেলার পাশাপাশি ঢেউ-তোলা নদীর। যে নদীর দৃশ্য মাটির ওপরে দেখতেই দ্রষ্টা অভ্যস্ত, কবি কল্পনার জোরে তাঁর মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন নীল আকাশের মেঘের খেলার দিকে, সেই আকাশের বুকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিলেন ঢেউ-তোলা নদীর দৃশ্যটি। কল্পানার চোখে দেখা এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই অলংকার, এ অলংকারটি তৈরি দল অর্থের ওপর নির্ভর করেই। অতএব, এটি অর্থালংকার। অলংকারটি যে কেবল অর্থের ওপরই নির্ভর করছে, শব্দের ওপর নয়—তা বোঝা যাবে, যদি দেখি, বাক্যটির অর্থ ঠিকঠাক রেখে দুটো-একটা শব্দ বদলে দিলেও অলংকারটি বেঁচে গেল।

প্রথমে দেখা যাক 'মউজ' আর 'গগন' শব্দদুটির বদলে একই অর্থের 'ঢেউ' আর 'আকাশ' বসিয়ে। তাহলে কথাটি দাঁড়াবে এই :

'কোদালে মেঘের ঢেউ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে।'

দেখা যাচ্ছে, মেঘের খেলা থামে নি, 'গগন' 'আকাশ' হয়েও তার বুকে নীলরঙা নদীটি বইয়ে দিয়েছে

আগের মতোই, 'মউজ'-এর সৌন্দর্য 'ঢেউ' উঠেছে বলে এতটুকু কমে নি। অর্থাৎ, 'মউজ-গগনে'র তৈরি অর্থসৌন্দর্য 'ঢেউ-আকাশে'ও অব্যাহত। এই অর্থসৌন্দর্যই তো অর্থালংকার। শব্দ বদলালেও অর্থ বদলায়নি, অলংকারও সরে যায়নি।

একটু দেখে নিই শব্দবদলের অন্য পরিণাম। শব্দবদলের আগে 'মেঘের মউজ' আর 'গগনের গাঙ' শব্দগুচ্ছ-দুটির মধ্যে অর্থালংকারের একটুখানি আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একটি শব্দালংকার। 'মেঘের মউজ'-এ ম-ধ্বনির দুবার এবং 'গগনের গাঙ'-এ গ-ধ্বনির তিনবার উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি শব্দালংকার। কিন্তু, শব্দবদলের পরে 'মেঘের মউজ' যখন 'মেঘের ঢেউ' হল, তখন ম-ধ্বনিটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। তেমনি, 'গগনের গাঙ'-এর বদলে 'আকাশের গাঙ' আসার ফলে গ-ধ্বনির গাঙটিও শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ, একই সঙ্গে ম-ধ্বনি আর গ-ধ্বনির শব্দালংকারটি হারিয়ে গেল। শব্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দালংকারের এই অপমৃত্যু জানিয়ে দিল, শব্দবদল এ অলংকারের পক্ষে অসহ্য। অথচ, অর্থালংকার একটু আগেই তা সহ্য করেছে।

অর্থালংকার শব্দবদল সহ্য করে ততক্ষণ, যতক্ষণ বদলে-যাওয়া শব্দের অর্থটুকু অক্ষত থাকে। এটাই দেখা গেল 'মউজ' থেকে 'ঢেউ' আর 'গগন' থেকে 'আকাশ'-এর বদলে। এবারে 'মউজ উঠেছে'-র 'টুকরো ছড়ানো' আর 'গাঙে'-র বদলে 'রঙে' বসিয়ে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে অর্থবদল ঘটলে তার পরিণাম কী ঘটে :

'কোদালে মেঘের টুকরো ছড়ানো
গগনের নীলরঙে।'

দেখতে পাচ্ছি, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো থাকলেও তার খেলা নেই, অর্থবদলের আগে ঢেউ-তোলা নদীর যে দৃশ্য আকাশে রচনা করেছিল অর্থালংকার, 'মউজ' আর 'গাঙ' তাদের অর্থ নিয়ে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য। আকাশের গায়ে পড়ে রইল এদিক-ওদিকে ছড়ানো কয়েক টুকরো মেঘ—তার রং নেই, কোনো আকর্ষণ নেই, তার গায়ে কোনো অলংকারই নেই—না শব্দালংকার, না অর্থালংকার। শব্দবদলে শব্দালংকারের লোপ, অর্থবদলে অর্থালংকারের লোপ। অর্থাৎ, শব্দ না টিকলে শব্দালংকার বাঁচে না, অর্থালংকার বাঁচতে পারে। কিন্তু, শব্দের সঙ্গে অর্থও সরে গেলে শব্দালংকারের সঙ্গে অর্থালংকারের সহমরণ ঘটে।

অতএব, শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য মূল তিনটি :

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার—প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে ; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারে সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। যে কটি লক্ষণ অলংকারগুলিকে শ্রেণিবন্ধ করছে, সেগুলি এইরকম—সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকেদের দেওয়া।

৩৯.৪ সারাংশ

কবিতার স্তবক বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তবে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। অর্থালংকার অর্থের অলংকার—অর্থের সৌন্দর্য। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে। অর্থ বদলে গেলে অর্থালংকার বাঁচে না। অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণি—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

৩৯.৫ অনুশীলনী-১

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬১-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।)

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।

৩. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৪. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

৩৯.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গো তুলনা করে থাকি। বলি, সতীর চোখদুটি শীলার চোখের মতো 'উজ্জ্বল' অথবা দার্জিলিঙের পাহাড় সিমলার মতো 'সুন্দর নয়' ইত্যাদি। এসব কথায় কোনো সৌন্দর্য নেই, অলংকার নেই। কিন্তু যদি বলি, 'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়', 'বাচ্চাটি ফুলের চেয়েও সুন্দর', তা হলে মনে মনে লাফিয়ে চলা ছেলেটার পাশে একটা ব্যাং-কেও লাফাতে দেখব, বাচ্চাটির মুখ তখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ ছেলেটার চলন আর বাচ্চাটির চেহারা এক-একটা ছবি হয়ে উঠবে আমাদের মনের চোখে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার। সাদৃশ্য এর লক্ষণ। সতীর চোখ, দার্জিলিঙের পাহাড় ছবি হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, একজনের চোখের তুলনা হল আর-একজনের চোখেরক সঙ্গো, ঐ পাহাড়টাকে তুলনা করা হল আর একটা পাহাড়ের সঙ্গো—অর্থাৎ, সদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা। এমন তুলনায় সৌন্দর্য নেই, অলংকারও নেই। অন্যদিকে, ছেলেটা ব্যাং বাচ্চাটি ফুল—এরা বিসদৃশ বলেই এদের তুলনায় সৌন্দর্য বা অলংকার হয়। এমনটা কেন হয়? দার্জিলিং-সিমলা সুন্দর হয়েও অলংকার পেল না, ছেলেটা ব্যাঙের মতো কুৎসিত লাফিয়েও অলংকার পেল কোন জাদুতে? এর কারণ, দার্জিলিং-সিমলার মতো সদৃশ বস্তুর তুলনায় কল্পনার প্রয়োজন নেই, যে দেখেছে সেই তুলনা করতে পারে তার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু ছেলেটা-ব্যাংটার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা একটা আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ। এ কাজে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সেই কল্পপনার জোরেই কেউ আকাশের চাঁদে ধান-কাটা কাস্তের সাদৃশ্য খুঁজে পান, কেউ পূর্ণিমার চাঁদে ঝলসানো রুটি দেখতে পান। এঁরা নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে এমন-এমন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বের করে আনেন, সেই সাদৃশ্য দিয়ে এমন-এমন কথার ছবি নির্মাণ করেন, যা পাঠকের মনকে সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ভরে দেয়। তখনই গড়ে উঠে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের, মধুসূদনের কাব্য-কবিতা এই গুণেই এতো মহৎ—এক-একটি কাব্য যেন এক-একটি চিত্রশালা।

অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষণীয় হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।

২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।

৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

তিনটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক :

১. ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।

২. আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই, কাব্যের জাল বুনি।

৩. এলো ওরা / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।

প্রথম উদাহরণে 'ননী' আর 'শয্যা' এই দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য। 'মত' শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ননী' আর 'শয্যা' পৃথক দুটি বস্তু, এদের পার্থক্য আকারে আয়তনে জাতিতে। একই বস্তু হলে 'মত' শব্দ দিয়ে ব্যবধান তৈরি করতে হত না। অতএব, পার্থক্য পুরোপুরি মানা হল। এই 'মত' শব্দটিই আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ননী কোমল, শয্যা ও কোমল। 'কোমলতা' গুণটি দুটি বস্তুতেই সমান, তাই বস্তুদুটির মূল্যও গুণের দিক থেকে সমান। অতএব, সমান মূল্যও বরাদ্দ হল 'ননী' আর 'শয্যা'র জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'কাব্য' আর 'জাল'-এর মধ্যে সাদৃশ্য। বস্তুদুটি অবশ্যই বিসদৃশ, পুরোপুরি পৃথক। 'কাব্য' কবির লেখা, হয়তো মুদ্রিত একখানি বই—পড়ে আছে পড়ার টেবিলে। 'জাল' সুতো দিয়ে বোনা, হয়তো ছড়ানো আছে নদী-পুকুরের বুকে, মাছের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালে রেখে কবি 'কাব্য' আর 'জান'-কে এক করে দিলেন। কাব্য আর কাব্য রইল না, জাল হয়ে গেল। কলম ছেড়ে দিয়ে কবি সুতো তুলে নিলেন হাতে, বুনতে থাকলেন,জাল-কাব্যের জাল। এইভাবে তৈরি হল 'কাব্য' আর 'জালে'র অভেদ—কল্পনা।

তৃতীয় উদাহণে 'ওরা' মানে ইংরেজ, 'তোমার নেকড়ে' মানে আফ্রিকার নেকড়ে। ইংরেজদের নখ তীক্ষ্ণ, নেকড়ের নখও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণতা দুদিকে সমান নয়। ইংরেজের নখ বেশি তীক্ষ্ণ—এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে নেকড়ের পার্থক্য বা ভেদ। এই ভেদের ওপরই জোর দেওয়া হল 'চেয়ে' শব্দটি প্রয়োগ করে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি ভঙ্গি।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !' —রবীন্দ্রনাথ

'রক্ত' আর 'জবাফুল'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করে অলংকার তৈরি হয়েছে উদ্ধৃত উদাহরণে। অতএব, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। বাক্যটিতে তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু 'জবাফুল।' 'এও' নির্দেশক সর্বনাম নির্দেশ করছে দুটি জবাফুল-কেই। কবির বক্তব্য জবাফুল নিয়েই, জবাফুল দুটি যে টুকটুকে লাল, এটাই কবি বলতে চান। অতএব, 'জবাফুল' প্রথম অঙ্গ—উপমেয়। জবাফুলের তুলনা হয়েছে রক্তের সঙ্গে। রক্ত যে কত লাল, তা সবার জানা আছে। সেই কারণেই রক্তের সঙ্গে তুলনা। অতএব, 'রক্ত' দ্বিতীয় অঙ্গ—উপমান।

রক্ত রাঙা, জবাফুলও রাঙা। রাঙা হওয়ার ধর্ম রক্তেও আছে জবাফুলেও আছে এবং এই ধর্মই জবাফুলকে তুলনীয় করেছে রক্তের সঙ্গে। অতএব, 'রাঙা' বিশেষণটিতে আছে এ শ্রেণির অলংকারের তৃতীয় অঙ্গ—সাধারণ ধর্ম।

'মতো' অব্যয়টি উপমান 'রক্ত'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে উপমেয় 'জবাফুল' আর উপমান 'রক্ত'কে বেঁধে রেখেছে একটি বাক্যে। এই বাঁধন-প্রক্রিয়াতেই ভিন্ন গোত্রের দুটি শব্দ জবাফুল-রক্ত একই বাক্যের মধ্যে ধরা দিল, 'মতো'-র ইঙ্গিতে বিসদৃশ বস্তুদুটি সদৃশ হিসেবে চিহ্নিত হল। অতএব, সাদৃশ্যবাচক 'মতো' অব্যয়ের সংযোজন ক্রিয়াটিই এ শ্রেণির অলংকারের চতুর্থ অঙ্গ-ভঙ্গি, সাদৃশ্য-প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি।

অর্থালংকারের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যমূলকে। ওই বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত ভঙ্গির ওপর। কীভাবে ভঙ্গির ওপর অলংকারটি টিকে থাকছে, দেখা যাক। আগের পাতায় উদ্ধৃত উদাহরণটিতে যে অলংকার হয়েছে, তার নাম 'উপমা' (একে একে অলংকারগুলির আলোচনা এর পরেই হবে)। এর অন্তর্গত উপমেয়-উপমান-সাধারণ ধর্ম—এই তিনটি অঙ্গের পরিবর্তনেও 'উপমা' উপমাই থাকবে :

মূল উদাহরণ—'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!'

পরিবর্তিত উদাহরণ—'এও যে দুধের তো সাদা, দুটি কাশফুল!'

এ দুটি উদাহরণের অলংকার যে একই, তা আন্দাজ করা যায়। এবারে ভঙ্গির পরিবর্তন করে দেখা যাক কী ঘটে :

	ভঙ্গি	ভঙ্গির চিহ্ন	উদাহরণ	অলংকার
১.	উপমানের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ।	'মতো'	'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!'	উপমা
২.	অভেদ-আরোপে উপমেয়-উপমান পাশাপাশি	'জবাফুলের রক্তলেখা'	'জবাফুলের রক্তলেখায় রাঙা চরণদুটি!'	রূপক
৩.	উপমানের সঙ্গে সংশয়বাচক শব্দের প্রয়োগ	'যেন'	'এও দুটি জবাফুল, যেন দুটি রাঙা রক্তাধার।'	উৎপ্রেক্ষা
৪.	উপমানের অনুল্লেখে একমাত্র উপমেয়	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা দেবীর চরণতলে।'	সমাসোক্তি
৫.	উপমেয়ের অনুল্লেখে একমাত্র উপমান	—'রক্ত'	'রাঙা রক্তের অঞ্জলিতে মায়ের পূজা হবে!'	অতিশয়োক্তি
৬.	সাদৃশ্যবাচক শব্দ + না-বোধক শব্দ = ভেদের প্রয়োগ	'মতো নয়'	'রক্ত এত রাঙা নয়, জবাফুলের মতো'	ব্যতিরেক

ওপরের আটটি উদাহরণ মূলত একই বাক্যের আটটি পরিবর্তিত রূপ। এ পরিবর্তন কেবল ভঙ্গির। উপমেয় (জবাফুল), উপমান (রক্ত), সাধারণ ধর্মের (রাঙা) কোনো পরিবর্তন নেই। আটটি ভঙ্গি থেকে পৃথক আটটি অলংকারের জন্ম, প্রতিটি অলংকারই সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের এক-একটি রূপ।

৩৯.৬.১ উপমা

সংজ্ঞা : **একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।**

(বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা)

বৈশিষ্ট্য :

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা, যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছ-টি—

(ক) পূর্ণোপমা ; (খ) লুপ্তোপমা ;
(গ) মালোপমা ; (ঘ) স্মরণোপমা ;
(ঙ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ; (চ) বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) পূর্ণোপমা :**

সংজ্ঞা : **যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণা + উপমা)।**

উদাহরণ :

(i) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'ছুরি', 'উপমান 'প্রভাতরশ্মি', সাধারণ ধর্ম 'তীক্ষ্ণদীপ্ত', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম'।

(ii) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে

গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারার- যথা ! —মধুসূদন

সংকেত : উপমেয় 'সিন্দূরবিন্দু', উপমান 'তারার-', সাধারণ ধর্ম 'শোভাসৃষ্টি', ('শোভিল'—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যথা'।

■ **(খ) লুপ্তোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যেকোনো একটি দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্তা + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে —সঞ্জীবচন্দ্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যে 'বন্যেরা' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'শিশুরা' উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য' (সুন্দর' হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'বন্যেরা' এবং 'শিশুরা' এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে। অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে

নাটোরের বনলতা সেন। —জীবনানন্দ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তলুনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনুট অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

চকি কলাপাতা সন্ধ্যা। —জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর 'কচি কলাপাতা' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গাই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। 'হরিণ-চোখ' আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের 'চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-ই হত উপমান। কিন্তু, প্রয়োগ-কৌশলে 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হরিণের চোখের মত চোখ'। 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা।

মন্তব্য : 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্মও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণী'র সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

■ **(গ) মালোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল
জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন। —বুদ্ধদেব বসু

সংকেত : উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(ii) উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'সঞ্চয়', উপমান 'ধূলি' আর 'তৃণ'।

৩৯.৬.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গো। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গো যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ ; নদী অঙ্গী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গোর সঙ্গো অঙ্গী উপমানের অঙ্গোর অভেদ হতে পারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

  (ক) নিরঙ্গারূপক ; (খ) সাঙ্গারূপক ; (গ) পরম্পরিত রূপক।

- নিরঙ্গারূপক দু-রকমের—

  (ক) কেবল নিরঙ্গারূপক ; (খ) মালা নিরঙ্গারূপক।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■**(ক) নিরঙ্গারূপক :**

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গোর অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গারূপক। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গারূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গারূপক (মালারূপক)।

উদাহরণ :

১. কেবল নিরঙ্গারূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'র ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।—মোহিতলাল

সংকেত : উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য : এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিরর্থক যমক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মৌবনে' শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দের মর্যাদা পাবে।

২. মালা নিরঙ্গারূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

(i) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চিরযামিনী। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ii) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'আমি', উপমান 'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপন', 'কাঁটা'। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

■**(খ) সাঙ্গারূপক :**

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গারূপক।

(অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গাসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গারূপক।)

উদাহরণ :

(i) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?

—যতীন্দ্রমোহন

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গা 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গা 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট

গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গো এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেইসঙ্গো উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গা 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরা'র ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গা যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(ii) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ; —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : অঙ্গী উপমেয় 'সৌন্দর্য', তার অঙ্গা 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গা 'বায়ু', তরী', 'পাল'।

■(খ) পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর ওকটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

(একটি নিরঙ্গারূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গারূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।)

উদাহরণ :

(i) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে। —রবীন্দ্রনাথ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আঁধারে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেইকারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

মন্তব্য : 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গা সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গারূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(i) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা । —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনা'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

৩৯.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়েরে তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ

● উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (বাচ্যা + উৎপ্রেক্ষা)

(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা)

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন, 'বুঝি', 'জনু', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৪র্থ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(i) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

■ **(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গা।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় 'ভগবতী'তে উপমান 'দীঘল তরঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গিতে 'তরঙ্গো'র নাচন কবি লক্ষ করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় 'ব্যাধ'-কে উপমান 'পতঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে 'ব্যাধ' আর 'পতঙ্গো'র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। —যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল'। বাইরের রূপে লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

৩৯.৬.৪ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং তার ব্যবহার বা আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আইম প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই। —নজরুল ইসলাম

সংকেত : যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন 'সানাই-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল 'সানাই'-এর ওপর। অতএব, 'সানাই' এখানে অনুক্ত 'মানুষ'-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

ব্যাখ্যা : 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা' (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য-অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়, আঁচল বুকে-টানা এলোচুলে বসে-থাকা উদাসিনী নারীর ব্যবহার বা আচরণ কবি আরোপ করেছেন, 'বসুন্ধরা'র ওপর। ওই 'নারী'ই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

৩৯.৬.৫ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা : **বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।**

(উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশেয়োক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয় লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। 'উপমা'য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, 'ব্যতিরেকে' ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, 'রূপকে' অসম্পূর্ণ অভেদ, 'অপহ্নুতি'-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, 'অতিশয়োক্তি'তে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ :

(i) মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা !

—মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৬ষ্ঠ সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ধৃত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অশ্রু এখানে অনুক্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা 'মুকুতা'। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় 'অশ্রু'-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান 'মুকুতা'র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম 'রূপকাতিশয়োক্তি')।

(ii) হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?

——মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/১ম সর্গ)

ব্যাখ্যা : বিধ্বংসী লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্পণখাকে। পঞ্চবটীবনে 'কালকূটে ভরা ভুজগ'টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা 'ভুজগ' (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্পণখা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, 'ভুজগ' এখানে উপমান-মাত্র, তার উপমেয় 'রামচন্দ্র'।

বক্তার (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় 'রামচন্দ্র' পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান 'ভুজগ' সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

৩৯.৬.৬ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার।

(উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দি-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

উদাহরণ :

(i) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা / সামান্য ক্ষতি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি', উপমান 'কলকল্লোল'। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক 'লাজ দিল' কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' লজ্জা দিল উপমান 'কলকল্লোল'কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে 'নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় 'কলকল্লোল' অপেক্ষা নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(i) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য /১ম সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপমেয় 'রাবণের রাজসভা' (ইহা), উরমান 'ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব-সভা'। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক 'ছার' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাবণের রাজসভা'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এখানকার অলংকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩৯.৭ সারাংশ-২

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়'—কথাটি বললে ছেলেটার চলন একটা ছবি হয়ে ওঠে আমাদের মনে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার—অর্থালংকার। 'ছেলেটা' আর 'ব্যাং'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে কল্পনার জোরে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা হল। সাদৃশ্যই এখানকার অলংকারের লক্ষণ। তাই, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। প্রধানত তিনটি উপায়ে এ সাদৃশ্য দেখানো হয়—বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়ে ('ননীর মতো শয্যা'), পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে ('কাব্যের জাল'), পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে ('নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে')। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ—উপমেয় (বর্ণনীয় বিষয়), উপমান (যার সঙ্গে তুলনা), সাধারণ ধর্ম (যা দুটি বস্তুতেই থাকে), ভঙ্গি (তুলনার)। কেবল ভঙ্গির পরিবর্তনে সাদৃশ্যমূলকে নানারকম অলংকার তৈরি হয়ে যায়—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ইত্যাদি।

উপমা : বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমার প্রধান বিভাগ তিনটি—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা। উপমার চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকলে পূর্ণোপমা, উপমেয় থাকলেও আর কোনো অঙ্গের লোপ হলে লুপ্তোপমা, একটি উপমেয়ের একের বেশি উপমান থাকলে **মালোপমা।**

রূপক : উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক। রূপক প্রধানত তিন রকমের—নিরঙ্গরূপক, সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক। কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একের বেশি উপমানের অভেদ আরোপ করলে **নিরঙ্গরূপক** (উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না)। উপমেয়-উপমানের অঙ্গসমেত অভেদ হলে **সাঙ্গরূপক।** একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ থেকে আর একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ তৈরি হলে **পরম্পরিত রূপক।**

উৎপ্রেক্ষা : উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষা দু-রকমের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকলে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** (পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি), সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ ছাড়াই সংশয় অনুমান করা গেলে **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা** (আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা)।

অতিশয়োক্তি : উপমেয় লুপ্ত আর উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি। 'নয়ন বর্ষিল **....** মুকুতা'—এখানে উপমেয় 'অশ্রু' লুপ্ত, উপমান 'মুকুতা' প্রবল।

সমাসোক্তি : উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হল সমাসোক্তি। 'বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে'—উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর উপমান 'নারী'-র ব্যবহার।

ব্যতিরেক : উপমেয়-উপমানের মধ্যে সাধারণ ধর্মের কমবেশি দেখানো হলে ব্যতিরেক। 'কলকল্লোর লাজ দিল আজ / নারীকণ্ঠের কাকলি'—সাধারণ ধর্ম 'কলধ্বনি' উপমান 'কল্লোল'-এর চেয়ে উপমেয় 'নারীকণ্ঠে-ই বেশি।

৩৯.৮ অনুশীলনী-২

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬১-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।)

১. সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার কীভাবে গড়ে ওঠে, লিখুন।

২. কী কী উপায়ে কবিরা দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে থাকেন, উদাহরণসহ লিখুন।

৩. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের কী কী অঙ্গা, একটি উদাহরণে সেসব দেখিয়ে দিন। কোন অঙ্গা বদলালে অলংকার বদলে যায়, লিখুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন :
পূর্ণোপমা, সাঙ্গা রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।

(গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।

(ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।

(ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(চ) কচি কলাপাত সন্ধ্যা।

৩৯.৯ মূলপাঠ -৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি

পাঁচটি লক্ষণ থেকে যে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ হয়েছে, এ কথা মূলপাঠ-১ থেকে আপনারা জেনেছেন। প্রথম লক্ষণ সাদৃশ্য, তা থেকে তৈরি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের পরিচয় পেলেন মূলপাঠ-২-এ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও চারটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

৩৯.৯.১ বিরোধমূলক অর্থালংকার

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উল্টোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক :

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।

৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।

৪. তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায় ?

প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা ঝরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আস্বাদ পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধা ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিঞ্চিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয়ে শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা তখন সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

বিরোধাভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধির অবসান ঘটে, তাহলে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার।

(দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস।)

উদাহরণ :

(i) বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা/পরিশোধ)

ব্যাখ্যা : 'মুক্তি'র বিপরীত 'বন্ধন'। 'শৃঙ্খলমুক্ত করা' আর 'শৃঙ্খলে বাঁধা' বিরুদ্ধ দুটি কাজ। অতএব, শ্যামা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলমুক্ত করে শৃঙ্খলেই বেঁধেছে—এ কথা শুনে মনে হয়, শ্যামার এ দুটি কাজের মধ্যে বিরোধ আছে।

কিন্তু এ শৃঙ্খলমুক্তি ‘ক্ষণিকে’র আর এ শৃঙ্খলে বাঁধা ‘অনন্তে’র। এর অর্থ, কারাগারের লোহার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি (যা মুহূর্তেই ঘটে গেছে) আর প্রেমের শৃঙ্খলে বন্ধন (যা চিরকালের)। এই অর্থবোধ থেকে শ্যামার দুটি কাজের আপাত বিরোধের অবসান ঘটল। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার হয়েছে।

(ii) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ
(নৈবেদ্য)

ব্যাখ্যা : ‘বন্ধন’ আর ‘মুক্তি’ বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, ‘বন্ধনমাঝে’ ‘মুক্তির স্বাদ’ পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু ‘বন্ধন’ যদি হয় ‘অসংখ্য’ আর ‘মুক্তির স্বাদ’ যদি হয় ‘মহানন্দময়’, তাহলে সে ‘বন্ধন’ আর ‘মুক্তি’র অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের সন্ধান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটেই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের মধ্যে থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই ‘বন্ধন’-‘মুক্তি’র আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

(iii) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ
(দেশবন্ধুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ব্যাখ্যা : ‘মৃত্যুহীন’ যে প্রাণ, ‘মরণে’ তাকেই দান করা হল। ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’-এর সঙ্গে ‘মরণ’-এর সংযোগ—এতে বিরোধ আছে। এ বিরোধ শব্দের সঙ্গে শব্দের, অতএব ভাষাগত বাহ্য বিরোধ। কিন্তু, কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহান পুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত। এখানে ‘প্রাণ’-এর অর্থ আত্মার বাণী, তার মৃত্যু বা বিনাশ নেই বলে সে-‘প্রাণ’ ‘মৃত্যুহীন’। আর, ‘মরণ’ কেবল শরীরের, ‘প্রাণে’র নয়। দেশবন্ধু তাঁর শরীরী মৃত্যুতে আত্মার অমর বাণী দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন—এই অর্থবোধ থেকে উদ্ধৃত স্তবকটির ভাষাগত আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার আছে।

৩৯.৯.২ শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার

শৃঙ্খলা মনকে প্রসন্ন করে, বিশৃঙ্খলা মনকে বিরক্ত করে—এটাই সুস্থ মানুষের মনস্তত্ব। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজকে মনে হয় সুন্দর, কাউন্টারের পাশে এমনকী সুশৃঙ্খল ক্রেতার পঙক্তিও সুন্দর, কিন্তু ভিড়-ঠাসা বাস বা ট্রেনের দরজায় ওঠা-নামার হুড়োহুড়ি বিরক্তিকর, অসুন্দর। আলমারির তাকগুলিতে থাকে থাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর, পড়া হোক বা না হোক। কারণ শৃঙ্খলা। টেবিলের এলোমেলো ছড়ানো বই গভীর পাঠের সহায়ক হলেও অসুন্দর। কারণ শৃঙ্খলার অভাব। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসের শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্য থাকলে সেটাই হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। এ শৃঙ্খলা আসতে পারে কারকের বিন্যাস থেকে, পদের বিন্যাস থেকে, কারণ-কার্যের বিন্যাস থেকে, অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রমশ নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে।

দুটো-একটা উদাহরণ দিই :

‘ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।’

দুটি বাক্য বা বাক্যাংশেই 'ছাড়ে' ক্রিয়াটি আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত নারদ-বীণা, পরে যুক্ত বীণা-গীত। প্রথমে 'নারদ কর্তা, 'বীণা' কর্ম, পরে 'বীণাই কর্তা হয়ে ওঠে 'গীত'কে কর্ম বানিয়ে। এই শৃঙ্খলা থেকেই অলংকারের জন্ম।

'ফুল চাই সখা, সাদা ফুল, মধুগন্ধিত সাদা ফুল।'

তিনটি বাক্যাংশ বাক্যটিতে। প্রথম অংশের সঙ্গে যে কোনো 'ফুল' থেকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে বেছে নেওয়া হল 'সাদা ফুল', সেই 'সাদা ফুল' থেকেও তৃতীয় বাক্যাংশের বাছাই হল একমাত্র সেই ফুল যেখানে মধুর গন্ধ আছে। এটাই শৃঙ্খলা, এখানেই অলংকার।

'পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন,
আর চুম্বনে মরণ।'

বাক্যাংশ এখানেও তিনটি। প্রথম অংশে 'পরশ' বা স্পর্শ থেকে 'চাহনি' বা দৃষ্টি, দ্বিতীয় অংশে 'দৃষ্টি' থেকে'চুম্বন', তৃতীয় বাক্যে 'চুম্বন' থেকে 'মরণ'—স্পর্শ থেকে যার শুরু, দৃষ্টি আর চুম্বন পেরিয়ে মরণে তার চূড়ান্ত পরিণাম। বিন্যাসের একটা শৃঙ্খলা বাক্যটিতেও আছে। এই শৃঙ্খলার সৌন্দর্যই এখানকার অলংকার।

একাবলি

সংজ্ঞা : পূর্ব-পূর্ব বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ উত্তরোত্তর বাক্য বা বাক্যাংশের যথাক্রমে বিশেষ্য বা বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হতে থাকলে যে শৃঙ্খলাজনিত অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম একাবলি।

(পূর্ব-পূর্ব বিশেষণ বা বিশেষ্যের উত্তরোত্তর বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি।)
উদাহরণ :

(i) তাঁহার কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল.... চিত্র বর্ণবহুল।

—বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের প্রথম বাক্যাংশের বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' দ্বিতীয় বাক্যাংশে বিশেষ্য 'বর্ণনা'য় পরিণত, দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষণ 'চিত্রবহুল' তৃতীয় বাক্যাংশ বিশেষ্য 'চিত্র'তে পরিণত। এইভাবে পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশের বিষেণপদ উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হতে হতে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

অতএব, এখানে 'একাবলি' অলংকার হয়েছে।

(ii) বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।
কমলে ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গে গীতিকা উঠে।।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের দুটি বাক্যে চারটি বাক্যাংশ। প্রথম বাক্যাংশের বিশেষ্য 'বাপী' (দিঘি) দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'কমল'-এর বিশেষণ পদে ('বাপীতে') পরিণত। দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'কমল' তৃতীয় বাক্যাংশে 'ভৃঙ্গ'-এর বিশেষণপদে ('কমলে') পরিণত। তৃতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'ভৃঙ্গ' (ভ্রমর) চতুর্থ বাক্যাংশে 'গীতিকা'র (সংগীত) বিশেষণপদে ('ভৃঙ্গে') পরিণত। 'বাপীতে', 'কমলে', 'ভৃঙ্গে' পদগুলি বিশেষণ—কারণ, এদের সংযোগে 'কমল', 'ভৃঙ্গ' আর 'গীতিকা' বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশে বিশেষ্য উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হল বলে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, এখানকার অলংকার 'একাবলি'।

৩৯.৯.৩ ন্যায়মূলক অর্থালংকার

'ন্যায়'-এর অর্থ যুক্তি তর্কবিচার। 'ন্যায়দর্শন' দর্শনই, কবিতা নয়। 'ন্যায়' বা যুক্তি-তর্ক-বিচার দর্শনের বিশ্লেষণের বিষয়, আলোচনার বিষয়, কিন্তু কবিতার বিষয় নয়। ওটা হতে পারে কবিতার একটা পদ্ধতি। এইরকম একটা পদ্ধতি হচ্ছে 'সমর্থন-এর প্রয়োগ। একটি কথা বলতে গিয়ে বা সেই কথার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর একটি কথার সমর্থন আসতেই পারে। এলে সেইটিই হবে যুক্তি বা 'ন্যায়'। সেই কথাটি 'ন্যায়'-এর সহযোগে কবিতা হয়ে উঠলে অর্থাৎ সেই কথাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য হলে তা হবে ন্যায়মূলক অর্থালংকার।

'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান।'

'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম'—এই কথাটি যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য সমর্থনে এগিয়ে এল পরের কথাটি—বড় দুটি গাছেরই মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকে, 'সমর্থন'ই এখানে যুক্তি বা ন্যায়। অলংকারও তাই ন্যায়মূলক।

'যত বড় হোক, ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা।
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।'

ইন্দ্রধনু বা রামধনু আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে বর্ণের সমারোহ নিয়ে ছড়ানো থাকে। দেখতেও ভালোই লাগে। কিন্তু তাতে লাভ কী ? সে তো থাকে বহুদূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাছে থাকলে তবেই তো ভালোবেসে তৃপ্তি। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটাই সমর্থিত হচ্ছে দূরের ইন্দ্রধনুকে সরিয়ে রেখে কাছের প্রজাপতি-পাখাকেই ভালোবাসার অভ্যাসে। কবিরা এই পথেই কবিতায় 'সমর্থন' তৈরি করেন, এইভাবেই তৈরি হয় ন্যায়মূলক অলংকার।

অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা : সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমে হতে পারে।

উদাহরণ :

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা ('পিতৃব্য') বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গো বাস করে ('হেন সহবাসে') বর্বরতা শিখেছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নরুচির মানুষের সঙ্গো চলাফেরা করে ('গতি যার নীচ সহ') তার নিজের রুচিও নীচেই নেমে যায় ('নীচ সে দুর্ম্মতি')। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ 'বর্বরতা কেন না শিখিবে ?' সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। —রবীন্দ্রনাথ
(কাহিনী/দুই বিঘা জমি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ধৃত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

৩. কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন—

হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ? —মধুসূদন
(মেঘনাদবধ কাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় এনে নিজের বংশকে বিনাশ করে দেবার যে আয়োজন বিভীষণ ('তাত') করল, সে কাজের অনৌচিত্য-ঘোষণা (উচিত কি তব একাজ') উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম অংশে রয়েছে। স্তবকের পরবর্তী অংশে আছে বিভীষণের বংশকৌলিন্যের ব্যাখ্যা। এই বংশকৌলিন্যই পূর্ববর্তী অনৌচিত্যের কারণ। স্তবকের পরবর্তী অংশের অন্তর্গত এই কারণটি সমর্থন করছে পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্গত কার্যকে (অনৌচিত্যকে)। এই সমর্থন থেকেই স্তবকটিতে একটি অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

মন্তব্য : লক্ষ করার বিষয়, প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'এ কাজ' অর্থাৎ বিভীষণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তার

বংশগৌরবের অনুরূপ কার্য নয়, অভিজাত বংশের সন্তান বিভীষণের পক্ষে 'এ কাজ'-টি করার মধ্যে যে 'অনৌচিত্য' রয়েছে, সেইটিই এখানকার কার্য। এই কার্য সমর্থিত হচ্ছে বংশগৌরবের বর্ণনা দ্বারা।

৪. কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন—

দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার।
মম্‌তাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার! —মোহিতলাল

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম বাক্যের 'তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার!' বাক্যাংশে সংশয়াত্মক 'নাকি' শব্দ 'ন্যায়বিচার' কথাটির অর্থ উল্টে দিয়েছে। তার ফলে প্রথম বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় : দীন্ দুনিয়ার মালিকের ন্যায়বিচারের অভাব। এই অভাবের কারণেই দ্বিতীয় বাক্যের দুটি বাক্যাংশের অন্তর্গত কার্যে বৈষম্য—মৃত্যুর পর মম্‌তাজেরই প্রতি সম্মান ('তাজের শিরোপা') আর নূরজাহানের প্রতি অবজ্ঞা ('কাফন সার') বরাদ্দ করে মালিক এই বৈষম্যই তাঁর বিচারে দেখালেন। অতএব, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত কার্য (মম্‌তাজ-নূরজাহানে বিষম বিচার) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'ন্যায়বিচার'-এর প্রতি সংশয়কে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের অভাবরূপ কারণকে। কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে উদ্ধৃত উদাহরণে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৯.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ :

'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'

এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ চেনা শব্দ, বাক্যের অর্থও অতি সহজ। কিন্তু সমস্যাটা তখনই তৈরি হয়, যখন লক্ষ করি, 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ'—বিদ্যুৎহীন গ্রাম-বাংলার এতদিনের অতি প্রয়োজনীয় এই দুটি বস্তুর গলা টিপে ধরলে তাদের মৃত্যু ঘটবে, তারা নিবেই যাবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না। জাদুর কৌশলে পাথরের গণেশ দুধ খায়, প্লাস্টিকের পুতুল কথা বলে, কিন্তু মাটির প্রদীপ ভাই ভলে ডাকে অথবা কেরোসিন-শিখা গলা টেপার হুমকি দেয়, এমন দুঃসংবাদ কখনো শোনা যায়নি। কবির কথাটাই তখন প্রলাপের মতো শোনায়। অতএব বাইরের অর্থ এখানে মূল্যহীন। এখানেই জরুরি হয়ে ওঠে চেনা শব্দ-বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর একটি অর্থ খুঁজে বার করা, যা কবির আসল বক্তব্য। ওই ভেতরের অর্থটিই গূঢ়ার্থ। সেই গূঢ়ার্থ যখন পাঠকেরক বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তার নাম গূঢ়ার্থপ্রতীতি। 'গূঢ়ার্থে'র এই 'প্রতীতি' যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে অর্থের গুণে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। কূঢ় অর্থের উজ্জ্বল আলোতে এসে 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ' তখন গৃহকোণটিকে আলোকিত করার তুচ্ছ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, এসে দাঁড়ায় সমাজের বৃহত্তর অঙ্গানে, নির্দেশ করে সমাজের দুটি স্তরকে। তখন তারা শুধু কথাই বলে না, কঠিন সত্যের উচ্চারক হয়ে ওঠে।

ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা : ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার।

(নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।)

উদাহরণ :

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা : শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু 'কেবল তুষ্ট বিল্বদলে' কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অন্তরের ভক্তিটুকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইঙ্গিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(ii) ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।

সংকেত : আমার স্বামী ভূত নাচিয়ে বেড়ান, এমন বিয়ে যিনি দিলেন, সেই নিষ্ঠুর বাপের মৃত্যু হলেই ভালো। এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু, আমার স্বামী ভূতনাথ—দেবাদিদেব মহাদেব, এমন স্বামীর সঙ্গে যিনি আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি হিমালয় পর্বত। এ অর্থ স্তুতিবাচক। নিন্দার ছলে স্তুতি।

২. স্তুতির ছলে নিন্দা—

(i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/প্রথম সর্গ)

ব্যাখ্যা : 'সুন্দর মালা' যার গলায়, তিনিও সুন্দর, শ্রদ্ধেয়। অতএ, উদ্ধৃত বাক্যের অন্তর্গত সম্বোধনে সমুদ্রের (প্রচেতঃ) প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হল, বাহ্যত তা স্তুতি বা প্রশংসার ভাষা। কিন্তু, বাইরের অর্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে (গূঢ়ার্থ) পৌঁছলেই বোঝায় যায়, এ 'মালা' আসলে বানরসৈন্যের তৈরি সেতু, যার বন্ধনে বাঁধা পড়ে অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্র আজ রামচন্দ্রের কাছে বন্দি। এ 'সুন্দর মালা'র গূঢ়ার্থ পরাক্রান্ত সমুদ্রের পায়ে বাঁধা শিকল'। সমুদ্রের পক্ষে এ লজ্জার, নিন্দার বিষয়। ভাষায় যাকে স্তুতি বলে মনে হয়, অর্থে তা নিন্দা বলে বোঝা গেল। সুতরাং উদ্ধৃত বাক্যে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

(ii) বন্ধু ! তোমার দিলে নাক দান
রাজ সরকার রেখেছেন মান !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন। —নজরুল ইসলাম
(সর্বহারা/আমার কৈফিয়ৎ)

ব্যাখ্যা : 'রাজ সরকার' (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ধৃত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। 'অ-মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করে (মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঙ্গিত করলেন একটি তথ্যের দিকে—সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণটি অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

স্বভাবোক্তি

সংজ্ঞা : বস্তুর আচরণ এবং স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনা যখন ওই বস্তুটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, তখন সেই বর্ণনা থেকে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার।

(বস্তুর স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি।)

উদাহরণ :

(i) কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ?
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ—
এই-সব শিশিকৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে। —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

(ii) মাল চেনাচেনি দল জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে যত টানাটানি ; —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যাখ্যা : তিনটি বাক্যাংশে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত বাক্যটিতে তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি' আর 'কানাকড়ি নিয়ে ......টানাটানি'। তিনটি ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়েছে কোনো বস্তুর স্বভাবের তিনটি বিশেষ লক্ষ্মণ। বস্তুস্বভাবের বর্ণনাটি ওই তিনটি লক্ষণের দ্বারা এতই সূক্ষ্ম সুন্দর এবং যথাযথ হয়ে উঠছে যে, বস্তুটি যে হাট, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাট-ই বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। অতএব, এখানকার অলংকার স্বভাবোক্তি।

৩৯.১০ সারাংশ-৩

বিরোধমূলক :

কার্য-কারণ সম্পর্ক ঠিক রেখে কোনো ঘটনা যেমন ঘটবার কথা, তার উল্টোটা কোনো কবিতায় ঘটলেই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। কিন্তু, এ বিরোধ বাইরের, ভেতরের অর্থে বিরোধ নেই। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—'শিশুর পিতা'-র ঘুমিয়ে থাকার উল্টো ছবিতে 'বিরোধ'। এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার—বিরোধমূলক অর্থালংকার।

বিরোধাভাস : দুটি বস্তুর মধ্যে বাইরে থেকে বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস। 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়'—গ্রহীতা গ্রহণ করছে, দাতার ঋণ বাড়ছে, বাইরে থেকে এ কথায় রয়েছে বিরোধ। গ্রহীতা প্রেম যত গ্রহণ করছে, দাতা তত ধন্য হচ্ছে, ভেতরের এ অর্থ বুঝলেই বিরোধ মিলিয়ে যায়।

শৃঙ্খলামূলক :

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, কাউন্টারের পাশে সারিবদ্ধ ক্রেতা, আলমারির তাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর। কারণ শৃঙ্খলা। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসে শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্যই শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন, আর চুম্বনে মরণ' 'পরশ' থেকে 'চাহনি'-'চুম্বন' হয়ে 'মরণ'-এ উত্তরণ—তিনটি বাক্যাংশের এই বিন্যাসে রয়েছে শৃঙ্খলা।

একাবলি : আগের বাক্য-বাক্যাংশের থাকা বিশেষ্য-বিশেষণের পরের বাক্য-বাক্যাংশে বিশেষণ-বিশেষ্য হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি। '.....কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল, ...চিত্র বর্ণবহুল'—বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' থেকে বিশেষ্য 'বর্ণনা', বিশেষণ 'চিত্রবহুল' থেকে বিশেষ্য 'চিত্র'।

ন্যায়মূলক :

'ন্যায়'-এর একটি অর্থ যুক্তি। এই 'ন্যায়' বা যুক্তির সহযোগে কোনো কথা কবিতা হয়ে উঠলে সেই কথার সৌন্দর্য হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি / মধ্যে রাখে ব্যবধান'—ঈর্ষা যে বড়োর ধর্ম, এটা বোঝাতে দুটি বড়ো গাছের মাঝখানে-থাকা ফাঁকা জায়গার যুক্তি বা 'ন্যায়ে'র সাহায্য নেওয়া হল।

অর্থান্তরন্যাস : একটি বাক্যের কথা (সামান্য বিশেষ কারণ বা কার্য) আর-একটি বাক্যের কথাকে (বিশেষ সামান্য কার্য বা কারণ) সমর্থন করলে অর্থান্তরন্যাস।

'হেন সহবাসে .... বর্বরতা কেন না শিখিবে ? / গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি'—দ্বিতীয় বাক্যের কথা (নীচের সঙ্গে মিশলে নীচ হতেই হয়) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের কথাকে (রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে বিভীষণ তো বর্বরতা শিখবেই)।

গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক :

শব্দ-বাক্যের বাইরের তুচ্ছ অর্থ পেরিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অর্থ (গূঢ়ার্থ) যখন পাঠকের বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতি অর্থের গুণে যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। 'মাটির প্রদীপে'র পক্ষে 'ভাই' বলে ডাকা আর 'কেরোসিন শিখা'র

পক্ষে গলা টিপে দেওয়া—এই বাইরের অর্থটা তুচ্ছ, অর্থহীন। কিন্তু ভেতরের অর্থে সমাজের দুটি স্তরের প্রতীক হিসেবে এদের সম্পর্কটা বাস্তব, অর্থপূর্ণ। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতিতেই রয়েছে কথার সৌন্দর্য, অলংকার।

ব্যাজস্তুতি : বাইরের অর্থে নিন্দা বা স্তুতি থেকে ভেতরের অর্থে স্তুতি বা নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি। 'ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে'—নেশাখোর মাতাল অসন্তুষ্ট শিবের প্রতি নিন্দা বাইরের অর্থে, ভক্তজনের কাছে আশুতোষ শিবের প্রতি স্তুতি ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে। 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ'—সুন্দর মালা-পরা সমুদ্রের প্রতি স্তুতি বাইরের অর্থে, সেতুর বন্ধনে বন্দি সমুদ্রের প্রতি নিন্দা ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে।

স্বভাবোক্তি: বস্তুর স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থেকে বস্তুটি বোঝা গেলেই স্বভাবোক্তি। 'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি', 'কানাকড়ি নিয়ে ...... টানাটানি'—এ সব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বস্তুটি হাট। বাইরের বর্ণনা থেকে ভেতরের বস্তুটির বোধ জেগে-ওঠা, এটা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। এখানেই অলংকার।

৩৯.১১ অনুশীলনী-৩

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬২-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।)

১. বিরোধ শৃঙ্খলা ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি—অর্থালংকারের এই চারটি লক্ষণ থেকে কীভাবে চারটি শ্রেণির অলংকার গড়ে ওঠে, একটি করে উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে দেখিয়ে দিন।

২. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, একাবলি, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

৩. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

(খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।
** ** ** **
জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?

(গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি....

(ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।